প্রীতি-সম্মেলন

[এবার আমাদের ছাত্রাবাসে দশম বাৎসরিক উৎসব মহাসমারহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। নাট্যাচার্য্য মাননীয় শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই উৎসবে কলেজের অধ্যাপকগণ, ছাত্রগণ ও স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণ প্রভৃতি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ছাত্রাবাসটী নানাবিধ ছায়াচিত্রে, বৈদ্যুতিক আলোকে ও নানাবিধ পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। যথাসময়ে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলে নিম্নলিখিত অভিভাষণটী পাঠ করা হয়। তৎপরে নির্ব্বাচিত দৃশ্যাভিনয় আনন্দ ও জয়ধ্বনির ভিতর দিয়া সুসম্পন্ন হইবার পর সভা ভঙ্গ হয়।]

'একি কৌতুক নিত্য নূতন,
ওগো কৌতুকময়ী,
আমি যাহা-কিছু বলিবারে চাহি
বলিতে দিতেছ কই ?'

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ,

আজ আমাদের মাঝখানে আপনাদের পেয়ে যে কত আনন্দ হয়েছে তা প্রকাশ ক'রে বল্‌তে গেলে ভাষা ফুটে বেরোয় না,—বেরোয়ত তার দৈন্যই বড় হয়ে উঠে, কিন্তু যা বলার তার কিছুই বলা হয় না। প্রাণের ভেতর যখন আবেগের তরঙ্গ গর্জ্জে উঠে, তখন তাকে ভাষার বাঁধনে বেঁধে রাখা যায় না—সে উল্লম্ফনে তার সীমাকে ডিঙিয়ে যায়—তাই তার অভিব্যক্তি হয় আভাসে ইঙ্গিতে, সঙ্গীতে ছন্দে। ভাষা জিনিষটার একটী সীমা-রেখা আছে—কথায় যা সার্থকতা তা ভাষার গণ্ডিটাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না—কথাটা ফুরিয়ে গেলেই তার সবটুকু নিঃশেষ হয়ে যায়। তাই যখন একথা কিছু বড় ক'রে বলার প্রয়োজন হয়—তখন শুধু

কথায় চলে না, তার সঙ্গে জুড়ে দিতে হয় সুরের আলো আর ছন্দের ভঙ্গিমা—কেননা কথাগুলো থেমে গেলেও তার ঝঙ্কার থাকে —আর থাকে ছন্দের দোলা; তাই সুরটী তার লীলায়িত ভঙ্গিতে প্রাণের দ্বারে এসে তার কাঁপন-দোলা দিয়ে যায়—

'Music, when soft voices die
Still vibrates in the memory'.

কাজেই কিছু বড় ক'রে বল্‌তে গেলে মুখকে চেপে প্রাণের দুয়ারটা খোলা রাখ্‌তে হবে—কেননা সঙ্গীত ছাড়া আজ কথার স্থান নেই।

আজ আপনাদের পেয়ে প্রাণের ভেতর কিসের যেন একটা অনুভূতি জেগে উঠেছে—

'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে
হৃদয় নাচে রে।'

তাই 'লোকারণ্য'-এর কবি বলেছেন আমি জগতের শোভা-সম্পদ্ সব নিঃশেষ করেছি—পাহাড়ের গায়ে ঝরণা, পূর্ণিমা-রাত্রের জ্যোৎস্না, নদীবক্ষে ঢেউ, উদ্যানে ফুলের হাসি—সব দেখিছি কিন্তু লোকারণ্য যেমন ভাবে আমার মনকে ডুবিয়ে দিয়েছে—তেমনটী আর কিছুতেই পারেনি। সেই লক্ষকোটী মূকমৌন অন্তস্তল ভেদ ক'রে যে আনন্দের ধ্বনি আকাশ বাতাসকে মুখরিত ক'রে তোলে জগতে তার তুলনা কোথায়?

আজ আমরা উৎসবের যাত্রী। আনন্দে প্রাণ কানায় কানায় পূরে উঠ্‌ছে—আজ বল্‌বার অনেক কথাই আছে—কিন্তু সেগুলো নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা নয়—নিজেদের ভালমন্দের কথাও নয়। আজ যা কিছু বল্‌বার আছে সেটুকু বিশ্বের কথা, সেটুকু সবারই

কথা। নিজের ব্যক্তিত্বকে ভুলে বিশ্বের মাঝে দাঁড়াতে না পারলে উৎসব হয় না—মিলনের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায়। উৎসবের দিনে নিজের ভালমন্দ-বিবেচনা ছেড়ে, নিজের ঘরের কথা ছেড়ে পরের কথা, বাইরের কথা ভাব্‌তে হবে। নিজের কাজ—নিজের ব্যক্তিগত ভালমন্দের কোন মূল্যই সেদিন দেওয়া যাবে না। সেদিন বাহিরের ডাকে সাড়া দিতে হবে—সব সেদিন পড়ে' রইল—নিজেকে টেনে এনে একবার বাহিরের মধ্যে ছেড়ে দাও, বাহিরটাকে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি কর—তবেই উৎসবটা সার্থক হ'বে মিলনটা ঘনিয়ে আস্‌বে।

'ওরে যাব না আজ ঘরে রে ভাই,
যাব না আজ ঘরে ;
ওরে আকাশ ভেঙ্গে বাহিরকে আজ
নেব রে লুঠ করে'।'

এই মিলনটা আমাদের প্রথম নয়। একটী একটী করে' আরও নয়টী মিলনের উৎসব এখানে হয়ে গেছে—এমনি ভাবে, এমনি হালকা প্রাণের ভাবের হিল্লোলে। দেশের যাঁরা তরুণ প্রাণের যাঁরা দরদী,—বিশ্বকে যাঁরা আপন ক'রে নিয়েছেন—তাঁরা মিলনের এ ডাক অগ্রাহ্য করতে পারেন না—সাড়া দিয়েছেন। এই মিলন-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ৺ দেশবন্ধু, প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলীর নাম জড়িয়ে আছে। আজ আপনাকে আমাদের মাঝখানে পেয়ে প্রাণ দশহাত উঁচু হয়ে উঠেছে—আপনাকে জানাচ্ছি আমাদের প্রাণের উচ্ছ্বাস—আপনার মহত্ত্ব, গুরুত্ব আজ আমরা জানিনে—আপনি এতবড় এইটেও বুঝিনে—কেবল বুঝি আপনি আমাদেরই একজন—এই উৎসবের যাত্রী।

জানিনে এই উৎসবকে কেহ প্রাণের অপব্যয় ব'লে মনে করেন কিনা। কিন্তু এটা সত্যি যে উৎসব না হ'লে জীবনটা মরুভূমি হয়ে

যেত—প্রাণের কোন স্ফূর্ত্তিই হ'ত না—উৎসব না হ'লে প্রাণের জরামরণ আসে—উৎসব প্রাণের অমৃতপরশ। নিতান্ত কাজের চাপে প্রাণটা যখন আইঢাই করতে থাকে, তখন বাইরে এসে সে হাফ ছেড়ে বাঁচে—তার সীমাবদ্ধ জীবনের বাইরে এসে একেবারে যেন একটা নূতন মানুষ হয়ে পড়ে। সেদিন বিশ্ব তার আপন ঘর ; মাথার উপর নীল আকাশ তার চাঁদোয়া ; বিশ্ববাসী তার ভাই। সে ভুলে যায় আপন অস্তিত্ব, ভুলে যায় তার ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব, সে তাকে বিকিয়ে দেয় একটা বিরাট অখণ্ডের পায়ে। তাই বসন্ত যখন তার বার্ত্তা নিয়ে আসে তখন প্রকৃতির রাজ্যে একটা মহোৎসবের সাড়া প'ড়ে যায়। কার স্পর্শে যেন তরুর শাখা ভেদ করে' ফুল বেরোয়, পাখীর কণ্ঠে কাকলী ছুটে, ধরার বক্ষ সবুজে রঙিয়ে উঠে সেদিন কেহই যেন আর নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত নয়—সবাই সেই উৎসবের টানে হন্ হন্ করে ছুটে চলেছে—যেন চারিদিকেই আনন্দের আগুণ লেগে গেছে। সেই আনন্দের ঢেউটা যখন কাজের মধ্যে উঁকি দিয়ে ডেকে বলে—সব কাজ ফেলে দিয়ে ছুটে এস, তখন তাকে অগ্রাহ্য করা চলে না—কারণ অন্তরের মধ্যে যে ঠাকুরটী আছেন তিনি হচ্ছেন উৎসবের দেবতা। তাই বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতি যখন তার নূতন নূতন সাজ প'রে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ান, তখন কেমন করে' মানুষের মনটাও তার লাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে উৎসবের জন্য পাগল হয়ে উঠে—কালিদাস ত 'ঋতুসংহারে' একথাটাই বলেছেন। " আজ এই শরৎ-প্রকৃতিতে যে আনন্দের মত্ততা লেগে গেছে—প্রাণের ঠাকুরটী তার থেকে দূরে থাকতে পারে নি। "

একটু তলিয়ে দেখ্‌লেই দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, এই উৎসবটা হচ্ছে মিলনের—সেখানে বিরোধ সেখানে উৎসব হতে পারে না। মানুষের মধ্যে যে সত্যিকার দেবতাটী বাস করেন তিনি হচ্ছেন মিলনের দেবতা।

বস্তুতঃ মানুষের মধ্যে একটি মিলনের যোগসূত্র আছে। যে দিন সেই দেবতাটীর সঙ্গে সত্য পরিচয় হবে, সেদিন বিরোধ ঘুচে গিয়ে সত্যের আলোকে সব স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌বে, আর তা না হ'লেই বিরোধের অন্ধকার সব ছেয়ে ফেল্‌বে। মানুষের নীচতা, ক্ষুদ্রতা ও স্বার্থই এই দেবতাটী জ্ঞানের আলোক হ'তে আড়াল ক'রে রাখে—তার জন্য দায়ী মানুষ—মানুষের দেবতাটী নয়। তাই কবিবর Wordsworth দীর্ঘশ্বাস ফেলে নৈরাশ্যের সুরে গেয়ে উঠ্‌লেন—'what man has made of man? মানুষের অন্তর-দেবতাটী একই বিরাট অখণ্ড পুরুষের রূপান্তর। কাজেই এই সত্যটী বুঝ্‌তে পার্‌লে মূলে কোন গোলই থাক্‌বে না। দেশ কাল পাত্রের ভেদ ঘুচে গিয়ে একটা বিরাট রাজ্যের রচনা হবে যেখানে বিরোধ ব'লে কিছুই থাকবে না। তাই "তীর্থসলিল'এর কবি 'জগত্তীর্থের' সলিল কুড়িয়ে লিখ্‌লেন 'জাতির পাঁতি'—জগতের মাঝে আছে এক জাতি, মানুষ তাহার নাম।' এই জ্ঞান ফুটে উঠ্‌লে যুগান্তের অন্তরালে যারা ঢাকা পড়ে' গেছে বলে' মনে হয় তারাও নিতান্ত আপনার জন হয়ে উঠে। তাই মানুষের সহিত মিলনের সূঁত্র হচ্ছে এই সত্যটীকে চিনে নেওয়া, কেননা সত্য বস্তুর সহিত সত্যবস্তুর কোন বিরোধ নেই—তার বিরোধ আছে অসত্যের সহিত। তাই মিলনের উৎসবে মানুষকে ডাক্‌তে হবে এই সত্য বস্তুটীর নাম ধ'রে; তবেই সে সাড়া দেবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'যা সত্য তার জিওগ্রাফী নেই।'—আমরা বলি শুধু তাই নয়, তার ইতিহাসও নেই। সত্যের পরিচয় হ'লে আমরা দেখ্‌তে পাই যে এই সত্যটীই সৃষ্টির গোড়া থেকে চলে আস্‌ছে—এই অখণ্ড সত্যটী। হয়ত মানুষ তার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সত্যটীর উত্তর নানা রংএ ফলিয়েছে; কিন্তু সত্যকার পদার্থটীর কোন পরিবর্ত্তনই হয় নি। যা সত্য তার চেঁহারা বদ্‌লাতে পারে মানুষের দৃষ্টিতে এমনকি

মানুষের বিচার বুদ্ধিতেও ; কিন্তু তাতে সত্যের স্বরূপের কোন অদল বদলই হয় না, যেমনটী ঠিক তেমনটীই থাকে। একটীকে মূলসূত্র ধ'রে মানুষ নানাভাগে বিভক্ত হ'তে পারে, কিন্তু কেহই এটীকে এড়িয়ে চল্‌তে পারে না। তাই মিলনের দিনে এই সত্যটীকেই আঁকড়ে ধর্‌তে হবে, এইদিক থেকেই মানুষকে বুঝ্‌তে হবে।

কিন্তু এই সত্যটীর সন্ধান পাওয়া যায় শুধু ভালবাসার মধ্য দিয়ে। মানুষকে ভালবাস্‌তে না শিখ্‌লে, মানব তাকে হৃদয়ের সিংহাসনে না বসালে এ সত্যটীর সন্ধান মেলে না। মানুষকে মানুষ ব'লেই ভালবাস্‌তে হবে—তার অন্তরের দেবতাটীকে পূজা কর্‌তে হবে। শুধু বাহির দেখে বিচার কর্‌তে গেলে পদে পদে ভুলই হবে, এবং তাই ক'রে তাকে অগ্রাহ্য কর্‌লে, শুধু যে সেই রুষ্ট হবে তা নয়, আমাদের অন্তর-দেবতাটীও ক্ষুব্ধ হয়ে আমাদের ক্ষমা কর্‌বে না—

'মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।'

তাই তার দুর্ব্বলতা, তার ক্ষণিকের ভুলভ্রান্তির যবনিকার অন্তরালে যে দেবতাটী আছেন তাকে খুঁজে বের কর্‌তে হবে। শয়তানকে শাস্তি দিতে গিয়ে দেবতাকে ফাঁসিকাষ্ঠে দিলে, তার শাস্তিত নিজের কাছেই পাব—কারণ মানুষ আর যাই হোক, এই দেবতাটীকে বাদ দিয়ে কিছু নয়। তাই বিবেকানন্দ একদিন বলেছিলেন 'গরুতে মিথ্যা কথা বলে না, দেয়ালে চুরি করে

না, তবু তারা গরুই থাকে আর দেয়ালই থাকে। মানুষ চুরি ক'রে মিথ্যা কথা কয়, আবার সেই মানুষই দেবতা হয়।' কাজেই মানুষের প্রতি আমাদের যত বড় অভিযোগই থাকুক, এই দেবতাটীর বিরুদ্ধে কিছুই বলা চলে না—সেখানে যে সব মানুষ এক সেখানেত কোন বিরোধ নেই। এই সেদিনও ত শরচ্চন্দ্র বলেছেন—'ত্রুটী, বিচ্যুতি, অপরাধ, অধর্ম্মই মানুষের সবটুকু নয়, মাঝখানে তার যে বস্তুটী আসল মানুষ—তাকে আত্মা বলাও যেতে পারে—সে তার সকল অভাব, সকল অপরাধের চেয়েও বড়। আমার সাহিত্য-রচনায় তাদের যেন অপমান না করি। হেতু যত বড়ই হোক মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মে যায়, আমার লেখায় কোন দিন যেন না এত বড় অন্যায় প্রশ্রয় পায়।' তাই বল্‌ছিলাম্ এই ভালবাসার নিকট দেবতাটী কিছুতেই গোপন থাকতে পারে না। তাই মানুষের মিলনক্ষেত্র হচ্ছে এই ভালবাসার মধ্য দিয়ে।

এই মিলনের ভারটী আমাদের নিতে হবে। মানুষকে মানুষের মত ক'রে দেখাবার মত অন্তর্দ্দৃষ্টি লাভ কর্‌তে হবে। মনুষ্যত্বের দাবীকে মাথায় রেখে সবাইকে ডাক্‌তে হবে। আমাদের মনে রাখ্‌তে হবে—

'.....এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা ; এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্নবুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ; ডাকিয়া বলিতে হবে
মুহূর্ত্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে ;'

তা-না হ'লে যে বিরোধের প্রাচীর মাথা তুলে দাঁড়াবে। আমরা মর্ত্ত্যকে বিরোধের আখড়া করে মিলনের জন্য স্বর্গ চাইনা, আমরা চাই বিরোধকে ধ্বংস ক'রে মিলনের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে এই পৃথিবীটা-কেই স্বর্গ ক'রে গড়ে তুলতে। আমরা গড়া স্বর্গ চাই না, আমরা

চাই স্বর্গ গড়্‌তে, কারণ গড়ার মধ্যে যে আনন্দ আছে আমরা তার থেকে কিছুতেই বঞ্চিত হব না, কেননা এই গড়ার ভিতর দিয়েই দেবতাটীর যথার্থ পরিচয় হবে, এখানেই তার সার্থকতা, এখানেই তার পরিণতি, কারণ যে শ্রম দ্বারা লাভ করা যায়, তাকেই ঠিকমত পাওয়া যায়—আর পাওয়া যায় ব'লেই পাওয়ার মূল্য ক'মে যায়। তাই আজ এক কথা 'আত্মানং বিদ্ধি'; তাহ'লেই 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' হয়ে যাবে। আমাদের যত গলদ, বাদবিসম্বাদ শুধু অজ্ঞানের উপর। এই অজ্ঞানের যবনিকা একটু সরিয়ে দিলেই, দেবতা তার মূর্ত্তি নিয়ে বেরিয়ে পড়্‌বে। তখন বিশ্বের মধ্যে একটা আলিঙ্গনের সাড়া প'ড়ে যাবে।

'দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি',
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক বিজলী,
প্রভাত-গগনে কোটী শির তুলি,
নির্ভয়ে আজি চাহ রে।'

এই মিলনের অগ্রদূত হচ্ছে যৌবন। আজ দিকে দিকে যে কান্নার রোল উঠেছে—তাকে নিরোধ কর্‌তে হবে, আর যৌবনই তা পার্‌বে। তার অন্তরে যে অফুরন্ত শক্তির উৎস—ভাণ্ডারের চাবি আছে সেই নিত্য জাগ্রত দেবতার কাছে—সেত কখনো ঘুমিয়ে প'ড়ে প্রাণটাকে শূন্য অর্থহীন ক'রে তোলেনা, তার চাঞ্চল্য কেবলই বাহিরের দিকে ঠেল্‌তে থাকে, এবং শিঙ্গা ফুঁকিয়ে ঘুমন্তকে জাগিয়ে তুলে, তার স্বরূপ বুঝিয়ে দেয়:—

'তোমার বাণী দখিন হাওয়ার বীণায়
অরণ্যেরে আপনাকে তার চিনায়।'

তাই যৌবন যখন তার সৌন্দর্য্যের সন্ধান পায় তখন কিছুতেই আর সে স্থির থাক্‌তে পারে না—প্রাণে যে তার দেবতা জেগেছে,

সে যে অমৃতের পরশ পেয়েছে ; সুন্দর যে আজ তাকে অভিনন্দিত করেছে—তাই আজ তাকে এই বলে' নমস্কার জানাচ্ছি :—

সমুদয় মানবের সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া
হও তুমি অক্ষয় সুন্দর ;
ক্ষুদ্র রূপ কোথা যায় বাতাসে উড়িয়া
দুই চারি পলকের পর।
তোমার সৌন্দর্য্যে হোক মানব সুন্দর,
প্রেমে তব বিশ্ব হোক আলো ;
তোমারে হেরিয়া যেন মুগ্ধ-অন্তর
মানুষে মানুষ বাসে ভালো।

বিনীত
শ্রীরমেশ চন্দ্র সাহা।
ক্যানিং হোষ্টেল।

রবীন্দ্রনাথ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

রবীন্দ্রনাথ গীতিকবি—হৃদয়াবেগকে সুরের অনির্ব্বচনীয় ভাষায় ফুটিয়ে তোলাই তাঁর জীবনের একমাত্র মূলমন্ত্র। কাব্যশক্তির যেখানটিতে শেষ সীমা, সেখানটিতেই সে বীণার ঝঙ্কারের মধ্যে সংলগ্ন হয়ে যায়। কাব্য প্রথমত বাক্য ও অর্থের সাহায্যে প্রথমে মানসলোকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তারপরে মনোরাজ্যের মধ্যে অনন্ত-